জনারণ্যে
জনশূন্যতায়
রোদে
কিছু
যাচ্ছে

দাদা

কিচ্ছু লাগলে

বলবেন

দাদা
কিছু লাগলে
বলবেন

কবিতায় লিখিত পৃথিবীর কোন শব্দ ব্যক্তিগত নয়, শব্দ আপনার ভূস্বামী হয়ে ভোগ করার বস্তু নয়। আপনারা যখনই কবিতার ইশকুল করতে চেয়েছেন, যখনই নিজেকে খুজে পাচ্ছিলেন না নিজেদের কবিতায়, যখনই কোমর ভাঙ্গা **"দ"** এ গলায় বেঁধেছেদে বেল্ট হয়ে গিয়েছেন মাসিক চুক্তিতে প্রাতিষ্ঠানিক কুকুরছানা, তখনই দাবি করে বসেছেন কবিতা চুরী করার বিষয়, ধ্যাত আপনাদের খুব প্রিয় বোধহয় সেই ব্রিটিশ শিক্ষক যিনি জানতেন **'নবাব সিরাজউদ্দৌলা মূলত উইপোকার কামড়ে ১৮ নং পৃষ্ঠায় মারা গিয়েছেন।'**

কোন উদ্দেশ্য নেই কবিতার মানুষের কাছে মানুষের কবিতা হয়ে ফিরে যাওয়া ছাড়া, কবিতার আন্দোলন বলে কয়ে হয়না। কবিতা নিজেই একটা আন্দোলন তাই তাকে নষ্ট করবার কোন অধিকার কারো নেই।

শুধু এতটুকু মনে রাখা প্রয়োজন - জয়ী আঙুল কবিতা লিখেনা। তাই **'কিছু লাগলে বলবেন'**।

এইখানে তাদের কবিতা আছে যারা জানেনা আসলে গন্তব্য কোথায়, ঠিকানা কি? তারা জানে নিষ্ফল জন্মে কবিতা ছাড়া কিছুই জানেন না তারা।

ভালো থাকবেন, সম্পাদকহীন কবিতার এই ছোট্ট প্রয়াসের সাথেই থাকবেন, আর অনেকে জানেন ও না কবেকখন কারা তার কবিতা নিয়েছিলেন এখানকার জন্য তার সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম থেকে, যদি এভাবে নেয়াতে আপত্তি থাকে তবে আমাদের মেইল করুন kichulaglebolben@gmail.com

রাকিবুল হায়দার ।। শাহানাজ মৌ ।। আসমা অধরা
রাশা নোয়েল ।। সজল বি রোজারিও ।। আহমেদ মুসা
বনী ইসরাইল ।। ইলতুত মন্ডল ।। জামি জাহান
শুভ্রজিৎ বড়ুয়া ।। হিমেল হাসান বৈরাগি ।। আতিক হাসান
অক্ষর অনীক ।। সাম্য রাইয়ান ।। বোরহানউদ্দিন আহমেদ
ইবনে শামস ।। সুমিত রনি ।। মোবারক হোসেন হৃদয়
অনির্বাণ সূর্যকান্ত ।। অ্যালেন সাইফুল ।। শুভনীল ।। ফারুকুর রশিদ
রাইসুল নয়ন ।। তামান্না তুলি ।। সোয়েব মাহমুদ

জনারণ্যে জনশুন্যতায় ক্রুশবিদ্ধ রোদে উড়ে যাচ্ছে রক্ত বীর্য আর ঘাম। কিছু লাগলে বলবেন।

রাকিবুল হায়দার
ম্যাজিশিয়ান।

ঐ গ্রামে আমাকে লোকে জাদুকর বলতো, তোমাদের শহরে আমি ম্যাজিশিয়ান।
আমার এই কালো হ্যাট থেকে লালচে আদুরে বেড়াল, সোনার প্রলেপ মাখানো শেকল বেরোতো,
আজকাল সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ে- সাদা খরগোশ, একশ মিটারের রিবন।
আমি জানি, বেড়ালের গলায় সোনালী শেকল যতটা মানায়,
খরগোশের গলায় গোলাপী রিবন ততটাই বেমানান।
এর চাইতে বরং ঐ রিবনের একটা টুকরো-
কোন ভদ্রমহিলার পালকগোঁজা হ্যাটে বেশ মানাতো।
ঐ গ্রামে চেনা গৃহবধূর যে হাততালি অর্কেস্ট্রার মতো বেজে উঠতো,
এই শহরে সম্ভ্রান্ড় ভারী দস্ড়ানায় সে শব্দ দূরবর্তী সংকেত এর মতো বাজে।
গত একুশ শতাব্দী ধরে হৃদয়ে যে প্রেমিকা আমি বয়ে বেড়াই,
আমার এই বদলে যাওয়া তার কাছে গ্রাহনযোগ্য নয়।
তার প্রেমের সংকেতে আমি হয়তো গ্রামেই ফিরে যাবো,
ম্যাজিশিয়ানের আলখালা খুলে, শরীরে জড়াবো জাদুকরের চাদর,
আমার হাত সাফাইয়ের জাদুতে মন্ত্রমুগ্ধ হবে সেই চেনা গৃহবধূ,
হাততালিতে বেজে উঠবে কয়েকজোড়া কাঁচের চুড়ি,
আমি আবার পরিপূর্ন প্রেমিক হবো, তোমার হৃদয়ে।

শাহনাজ মৌ
বৃক্ষের জীবন অনাবাদী

*

গাছ বিষয়ক কবিতায় শিকড় থাকবেই
শিকড় জন্মায় স্থায়ী ঠিকানায়
যে চাষী চাষের জমিই পেল না-
তার বীজে পিঁপড়ার বাম্পার ফলন দেখে
দীর্ঘঃশ্বাসের গাছ দাঁত বের করে
চাষীর চোখে স্থায়ী ঠিকানা গড়ে -জমকালো অন্ধকার

*

রাজ্য সরকার খাজনা বাড়িয়ে দেয়
মাছিদের একজোড়া ডানা দশজোড়া হয়
আর রুগ্ন চাষীর গায়ে ফুটে উঠে ২০৬ টি হাড়ফুল

*

থুথু ফেলবনা, গলা শুকিয়ে যাবে
ঘৃণার বীজে কেবলই বিষ
সেচের জল সেও অনেক দামী
ঘৃণা বেঁচলে ভাত ফুটবেনা হাঁড়িতে..

*

রোদ ফুরায়
এ গল্প নষ্ট বীজের মতো। পানি চুষে পঁচে যায়।
অঙ্কুরোদগম দেখবেবলে যে চাষী রাত জেগে ছিল
তার বদনামে মাছিরা ভীড় জমায়।
মূলত,ইতিহাস সফলদের গায়ে জড়ানো চকচকে গহনা।

আসমা অধরা।

ঘোরের নাম সিসিফাস

মুক্তগদ্য

ঘোরের নাম মা, আর নিয়তির নাম সিসিফাস। মায়ের কথা ভাবলেই মুদে আসা চোখে ভেসে ওঠে ছায়াচিত্র, দুটো বাঘ টেনে ছিঁড়ে নিতে চাচ্ছে মা হরিণের দুইপাশ আর সেই মায়ের রেটিনার রিফ্লেকশন ক্যামেরায়- দুটো হরিণ শাবক দৌড়ে পালাচ্ছে দূরে, এর নাম আত্মত্যাগ, স্ববিসর্জন; সন্ড়ানের জন্য। আমাদের কান্নায় মিশে থাকে মায়ের জন্য হুতাশ।

কি করুণ মুখে ঘুমোয় মা, বুক ঠেলে ঠেলে জগদ্দল পাথরের মতন উঠে আসে কান্নারা। দিন দিন পাণ্ডুর হচ্ছে আমার মায়ের মুখ। অদ্ভুত সুন্দর গজদাঁত বের করে হাসতো আমার মা, মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতাম এক সময়ে, দিন দিন সে হাসি উবে যায়, কপালে আসে ভাঁজের পর ভাঁজ আর ভয়। বুকের ভেতর তার রক্ত দৌড়োয় না, ব্যাথায় নুয়ে থাকে সারাদিন। আর শুয়ে শুয়ে পড়তে থাকে সুরা, আয়াত, কেরাতসম সুরে কান্না গড়ায় চোখ থেকে গালে। আড়াল থেকে দেখি, দূরে সরে গিয়ে কাঁদি বুকভাঙ্গা গানের মতন বিলাপ।

এই সমস্ত অমাকালে, তার চশমার আড়ালে নিষ্প্রাভ হতে থাকে দৃষ্টি, প্রতিদিন একটু একটু করে নিভে যাচ্ছে, কমে যাচ্ছে আলো। ছানি পড়ছে আরো মোটা হয়ে। মা কিছু পড়তে গিয়ে চোখ আরো বড় বড় করে দেখতে চায়, চশমার কাঁচ মুছতে থাকে এমন ভাবে যেন কাঁচ পরিষ্কার করলেই সবআগের মতন হয়ে যাবে, পোয়াবারো দিনের মতন উজ্জ্বল।

আগের মতো মায়ের বুকের ভেতর মুখ গুঁজে দিয়ে ঘুমাতে পারিনা, আমার মায়ের শাড়ী ভরা কেমন শশা শশা গন্ধ, বুকের ভেতর মুখ চেপে ধরলেই ডাবভডাব গন্ধে বুক ভরে যেত। মা বড় বড় গাল করে মুখের ভেতর ভাত ঠেসে দিতো, তা গেলা তো দূর নাড়তেও পারতাম না। কত কত রাগ, অভিমান জমে থাকে বুকে! তবু বেড়ে ওঠার প্রতিদিনেই মা একটু করে হয়ে গেছেন তার আত্মজার। খণ্ডাংশে ভাগ হয়ে গেছেন স্বামী, পুত্র, কন্যায়। মায়ের আর কি থাকে নিজের? শরীরের অনু পরমানু থেকে

মাংসপিণ্ড অব্দি বিলিয়ে দেয়া ছাড়া।

মাটি দেখে দেখে মায়ের কথা মনে পড়ে, সর্বংসহা জননী। প্রায়দিন বাবা দুপুরে ফেরার সময় জনাকয় নিয়ে ফিরে খেতে বসেছে, ভাবেনি আমার মায়ের জন্য সামান্য কিছু পড়ে রইলো কিনা, ভাই তার বন্ধুবান্ধব নিয়ে খেয়ে গেছে, মুখ শুকিয়ে ঘুরেছে কেবল আম্মা। অথচ বড় টুকরো গুলো ভাগ করে দিয়েও নিজের পাতের ছোট খাটো টুকরো থেকেও বাবাকে, ছেলেকে ভাগ করে দিতে দেখে দেখে শিখেছি এটাই নিয়ম। কখনো কেউ হাতে করে আম্মার জন্য কিচ্ছু আনেনি, অথচ বাজারের টাকা বাঁচিয়ে এর জন্য শার্ট, তার জন্য স্যান্ডেল, তার জন্য কাপড় দেয়াই অলিখিত নিয়ম মায়ের।

এই মা নামের ঘোর কাটেনা, ঘোরের ভেতর থেকে দেখি দাউদাউ আগুনে জ্বলছে মা, বিকৃত হয়ে যাচ্ছে মুখের রেখা, শব্দ করা বারণ। আপত্তি করা বারণ, আপত্তি তোলা বারণ, একদিন ছুটি বারণ। সেই আগুনে এক আঁজল জল ঢালতে গিয়ে দেখি পুরোই পুড়ে গেছে মা, খসে পড়ছে চামড়া, গলে যাচ্ছে চোখ, চুল। নিয়তি মানাই যদি নিয়ম তবে মা ক্যান চেয়ে থাকে আকাশের দিকে অমন, আকাশ তো নেমে আসেনা কোনোদিন। জীয়ল পাথরের মতন আয়তনে না বেড়ে মা শুকিয়ে যায়, মায়ের চোখ আরো ঝাপসা হয়, মায়ের চামড়া প্রতিদিন কুচকে যায়, মায়ের শিরা সেই শীর্ণ হাত ভেদ করে যেন তার ডালপালা সমেত বটগাছের মতন ছড়াতে চায় শেকড় তার পুরো অস্তিত্ব জুড়েই।

জীবন জুড়ে হীরন্ময় আলো সে, সে উদাত্ত আহ্বান, সে ধ্যানস্থ পাহাড়, ঝুম বৃষ্টির দিন। আমি সেই আলোর ক্ষুদ্র কণা, উদার আহ্বানের সামান্য ইশারা, ধ্যানমগ্ন পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে পড়া নুড়িপাথর মাত্র এক, হয়তো ক্ষণিক শিশির, যে পৃথিবীসম এই বিশাল ছায়ার নিচে ততোধিক কম্পিত এক বিন্দুর ধারনা মাত্র।

বনী ইসরাইল

একাই হেঁটে যেতাম

পেরেক ঠুকতে গিয়ে একদিন নিজের ছায়া ঝুলিয়ে দিলাম হাড় জিরজিরে দেয়ালে
আঙুল দিয়ে কাঁচ কাঁটতে কাঁটতে চোখ থেকে খসে পরলো
অনেকগুলো শুন্যতার ব্যবহার
আমি শুন্যতা পুঁজি করে নারীদের বুকের কাছে মুখ রেখে বলতে চেয়েছিলাম যে,
এভাবে করুণা করো না,
এমন করে তুমি চুম্বন করো না আমার অন্যমনষ্ক যন্ত্রণাগুলোকে।
মুদির দোকানী যেভাবে গুনছে অভাব আর বাড়ছে বকেয়া রোজ রাতে
সংসারে আমার জুতো জোড়া আর যেতে চাইছে না
কেরানীর অফিসে, বাজারে, সিনেমা ঘরে
পার্কের ভাঙা বেঞ্চ অলসতায় দেখছে পথচারীকে
ঘুম পায়ে কেবল আসছে সন্ধ্যা আমার চোয়ালে
রাত হলে ফুলে উঠে গণিকাদের শুকনো বুক
হোটেলের বাইরে পায়চারী করে খুধার্ত কুকুর
এসব সব কিছু দেখে নিয়ে ধূর্ত পায়ে শেকল খুলছি
প্রতি রাতে বাড়ি মালিকের সঙ্গমের পরে।
খুব চুপ, খুব চুপ
কাশির শব্দ হলে নীলচে মুখ চেপে ধরি দুহাতে
মেস ভাড়া, মেস ভাড়া মাসের প্রথম কয়েকটা দিন কাটিয়ে দিই
পরিচিত বন্ধু আর পার্কের চেয়ারে
এসব ব্যক্তিগত কথা দিয়ে কবিতা হয় না
আমি তো কবিতা লিখি না, চাষার ছেলে কবিতা লেখে না
স্বস্ড়ার বিড়ি টেনে সেদিন মুখ দিয়ে কয়েক ফোঁটা রক্ত বেরুলো
সরকারি হাসপাতাল আমাকে নিল
আহা কি দরদ ওদের চোখে যেন অবিকল ক্রুশ বিদ্ধ যীশু
হাত পেতে করুণা চাইছে
তাগিদ, কেন এই অপরূপ উপহাস প্রিয় জীবন ঢিল ছুড়ে
রক্তাক্ত করছি নিজেকে সার্কাসের মাঠ থেকে খুচরো পয়সায় কিনে আনা মাগির
মতন?
পা দুটো বলেছে সেদিন
তুমি মরে গেলে বেঁচে যেতাম, একাই হেঁটে যেতাম।

ইলতুত মন্ডল

খেরোখাতা- ৮০

মাল্টিকালার দৃশ্যের ভেতর হেঁটে যায় মধ্যরাত।
লোকটি হড়হড় ক'রে বমি করে- হাতে ভর দিয়ে।
একটি কুকুর ধীর পায়ে হেঁটে আসে- লেজ নাড়ায়- বমি খায়।
আর একটি কুকুর দৌড়ে আসে- লেজ নাড়ায়- বমি খায়।
তারপর- কয়েকটি কুকুর দৌড়ে আসে- লেজ নাড়ায়- বমি খায়।
লোকটি হড়হড় ক'রে বমি করে- বিস্ফোরিত উজ্জল চোখ তার টুপ ক্করে
খুলে পড়ে- গড়িয়ে যায়।
দুরে কোথাও প্রহরীর বাঁশি কয়েকবার বেজে থেমে যায়।
একটি ছিঁচকে চোর দোকানে চাটাইয়ের উপর বসে নিশ্চিন্তে বিড়ি টানে।
লোকটি হড়হড় ক্করে বমি করে।
কুকুররা দৌড়ে আসে- লেজ নাড়ায়- বমি খায়...
১১-১০-২০১৮ ডেরা।

জামি জাহান
বরফপাথর

কতোকাল চলবে এ দখলদারিত্ব? সহাস্যমুখে দৃষ্টি পড়তেই মনে জাগালো 'এ বুঝি জীবন!' দৃষ্টিকোণে হাসির রেখা ফেলে যাচ্ছিলো প্রায় 'আজ তবে নতুন এলে?' প্রশ্নের পিছনে প্রশ্নগুলো বেশিই খড়খড়ে শোনায়। পা থেকে পায়ের কদমে দূরত্ব বাড়ছিলো ভীষণ মেঘ ছুঁতে হবে রোদের ওপাড়ে একটা রাত এবং দিনের ব্যবধানে আমাকে পিছনে ফেলে গিয়েছিলো শাবকদল এমনসব উপসর্গে ঠান্ডাজল অনুভূত হতো রোজ। ঠিক চার থেকে শতক পর্যন্ত গুনতে গুনতেই আমি পৌছে গিয়েছি পাহাড় চূড়োয় এখানে আকাশ একা, বিষণ্ন শেষরাতে না ঘুমিয়ে কাটানো ব্যধিগ্রস্থ চিবুকের মতো তার ধুয়াশা নীলাভ শরীরাংশ যে ছিলো আমার প্রথম প্রেমিক- যার জন্য একা একটা আস্ত রাত গিলে খেয়েছিলো মৌটিয়া পাহাড়। আমার দ্বিতীয় প্রেমিক ছিলো শাবকদলের দলপতি দৃষ্টি সম্মুখে তার অস্তিত্বের বদলে মিলে গিয়েছিলো কতিপয় চিহ্নাদি ধুয়াশা নীল আর রগরগে পাহাড়ের গন্ডদেশ বয়ে চলা এবড়ো থেবড়ো খাঁজের তোয়ালে বুননে ফুটিয়ে তুলেছিলাম সে সবের প্রেম। যদিও রাত গুলো দীর্ঘ ছিলোনা কিন্তু খুব ভোরে জেগে উঠবার তাড়া ছিলো বিনিময় প্রথায় অর্জিত ছিলো বেশ কিছু দুর্বোধ্য শব্দ। অথচ, মনে হতো আঁকড়ে রেখেছে কেউ ছাড়াতে গেলেই হয়ত হারিয়ে যাবে ক্ষুদ্র কোন প্রাণ! বিস্ময় আর আপুত কন্ঠের ভেজা আদরে হারিয়ে যেতে চাইতো খুব সৃষ্টরাজ স্বাক্ষী স্বইচ্ছেয় ফিরিয়ে দিইনি এক আউন্স তবুও ছায়া না ফেলে কেউ একজন ফিরে যাচ্ছিলো প্রতিবার প্রতিটা দিনের ক্ষুদ্র অংশ যথাসময়ে রোপন করে দিতে হতো পরিত্যক্ত পদচিহ্নে। কাঁটা ফুঁটে থাকা রক্তহীন চোখ দৃশ্যায়িত করে কালো রঙে সাঁজাতে চেয়েও কেবলি রক্তাক্ত হয়েছে, রঙীন নয়।

রাশা নোয়েল
দীর্ঘ ব্যাস–

এত স্বাভাবিক, অথচ দীর্ঘ এক ব্যাস হয়ে ওঠে বিস্তীর্ণ এক পরিধি
যেন কেউ বেরোতে পারবে না
চমৎকার এক দিনশেষে কেউ বলতে পারবে না
আমাদের চলার পথের মাঝে ফুটেছিল এক ফুল
মুকুরের মতন একা অথবা রিফ্লেক্স
কি আশ্চর্য! যেন অন্যকেউ ওপাশে, নাতিদীর্ঘ ছায়াপথ ধরে
আমাদের ক্লান্ড় পথচলা থেমে থাকার পরও এইসব ডিমের পৃথিবীর
তরকারি ভেদ করে কারও মুখের গ্রাস হয়ে উঠবার ব্যাকুলতা দেখে জানা যায়
আমরা প্রত্যেকেই ব্যাচেলর প্রাণী এবং সংসারহীন।
কোনো কিছু আজন্মলালিত বিদ্বেষ কারো প্রতি তোমার রক্তের গ্রুপ দেখে জানাও
যেতে পারে
আমরা প্ররোচিত হই কার দ্বারা যেন বা
তোমার পরিচিত কোনো সঙ্গী সাথেও থাকে
আমাকে দেখে বোঝা যেতে পারে আমিও কুইন্স গ্যাম্বিট খেলে অত্যন্ত পারদর্শী হয়ে
উঠছি
ডি-ফোর দেখে তুমিও মুভ করতে পারো তোমার বিশপ
শেষতক আমিই জিতে যাওয়ার অব্যর্থ সম্ভাবনায় তুমি রিজাইন করতে পারো
হেরে গিয়ে আরেক ম্যাচ বাজি ধরতে পারো
অথবা আমাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারো ভোরবেলায়
যেহেতু তোমার মগজ আলফা লেভেলে যায় নাকি মাঝেমাঝে
ক্লাসে তুমিও নাকি ঘুমাও, টিচার আমাকে ডাক দিয়ে বলতেই পারে তোমার বান্ধবী
কেন ঘুমায়
কেন একা একা বসে থাকে, কেন হোমওয়ার্ক বাদ দিয়ে পড়ে থাকে ইউনিয়ন নিয়ে
অথবা মিছিলে কেন যায়
কেন এইসব গভমেন্ট বিরোধী প্রচারণা চালায়
সে কি স্বপ্ন দেখে আশ্চর্য এক সকালের? যে সকালে সবাই ঘুম থেকে উঠে
দেখবে হোস্টেলে থাকা অব্যবহার্য এক থালার উপর জমে থাকবে না কোনো এঁটো
ময়লা?

চানাচুর মুড়ি থেকে বের হওয়া আদিমতম তাড়না যেন আমারও খিদে পায়, আমিও
চেঁচিয়ে মাথায় তুলি গোটা ব্রহ্মাণ্ড
আমার হাতের তালুতে থাকে প্রস্তরযুগের মিল্কিওয়ে তুমি দেখতে নাকি পাও
আমাকেও ডেকে বলো আমি এমন এক সময়ে ঘুমিয়ে ছিলাম কেন
কেন ঈশ্বর আমাকে কোনো ইন্দ্রিয় দেননি
কেন তিনি আমার ভেতর সৃষ্টি করলেন বিরাট এক গোয়াল, যে গোয়ালের প্রতিটি
গোরু দেখতে
আমার মতন, তারা আমার মতন নাকি ভাবে
আমার মতন দেখতে প্রতিটি খুর
সবকিছু আমার মতন দেখতে
যদিও এই যুগে আমি জন্মাইনি, আমি দেখতে পাইনি তোমার মতন আরো
সহস্র আরোপিত যাত্রী, আরো হাজার হাজার জমজ সন্তান, আমাদের পেটে
হাত দিয়ে দেখেও বোঝা যায় না তাদের চিন্তা চেতনা, তাদের ভারাক্রান্ত একটি
বিপন্ন মুখ
তুলে ধরবার প্রয়াসে আমি রাতজেগে একটি বিমূর্ত কবিতা লিখে দিয়ে আসি
এইসব রেয়ার বিদেশী ভাষায়
একটি কাব্যগ্রন্থ লিখতে চাইতে বসতে হয়, তুমিও বলো
আমাকে দেখে না কেউ, আমিই সবাইকে দেখেশুনে রাখি,
বাংলা ভাষার এইসব মানসম্মত টিউন খ'সে পড়ে গিয়ে ধারণ করে বিস্তীর্ণ এই রাত
যে রাতে আমাদের জন্ম নেয়ার কথা
আর পাশাপাশি ব'সে গ্রহণ করবার কথা মানবিক বিষাদ।
তুমি আরোপিত ধীরে ধীরে করে রাখো অনেকদিন পর গেলাশের
টুংটাং থেকে উঠে আসা গ্রাম্যধর্ম,
পঞ্চায়েত রেগুলার হয় তোমাদের সমাজে আমাকে বিচারের অধীন রাখো মাঝেমধ্যে
আমিও সাজা পাই, আমাকেও তুমি বলো নক্ষত্র হতে হলে
পাশ করতে হবে এক্সামে
নিয়মিত এটেন্ড করতে হবে ইকোনমিক সেমিনারে,
শিখতে হবে কালচারাল বিহেইভিয়ার আর প্রেম করতে হবে প্রচুর
লোক দেখানো মানিব্যাগ থেকে উঠে আসতে দিতে হবে রাশিরাশি টাকা
ট্যাক্সের টাকায় বাড়তে দিতে হবে এইসব পৃথিবীয় বিল্ডিং
অনাগত সময়ে আমাকে কবিতা লিখতে বোলো না
এইসব ব্যক্তিগত সময়ে আমি ভাবি রাষ্ট্রের ভাঙন নিয়ে।

সজল বি রোজারিও
নেশার মতন

আমি অনেকটা নেশার মত । অভ্যাস হয়ে গেলে ছাড়তে পারবেন না, কিংবা ছাড়তে গেলে ভীষণ কষ্ট হবে । কেননা আমি ধীরে ধীরে মিশে যাবো শিরায়-উপশিরায়, তারপর রক্তে এবং মস্তিষ্কের প্রতিটি কোষে । আমাকে ছাড়তে পারবেন না, মানুষ কখনো অভ্যাস বদলাতে পারে না !

মাঝে মাঝে নিজের উপর নিজেরই রাগ ওঠে এবং বিরক্তির মাত্রা চরমে উঠে যায় । কিন্তু কিচ্ছু করার থাকে না । কারণটা কি জানেন ? ধরুন কারো উপর আপনার প্রায়শই রাগ ওঠে, কিংবা মানুষটা আপনার বিরক্তির কারণ, তো আপনি কী করবেন ? যেহেতু রাগ এবং বিরক্তি উভয়ই চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়ে, সুতরাং আপনি তার সাথে সম্পর্ক শিথিল করা শুরু করবেন । তারপর ধীরে ধীরে দূরে সরে যাবেন এবং একসময় ছেড়ে চলে যাবেন । কিন্তু নিজের উপর নিজের বিরক্তি তৈরি হলেও কিছু করার থাকে না । কেননা নিজের উপর নিজের কখনো রাগ করতে নেই, বিরক্ত হতে নেই, কিংবা অভিমান করতে নেই । কেননা নিজেকে কখনো ছেড়ে যাওয়া যায় না । নিজেকে ছেড়ে যেতে হলে যা করতে হয়, তাকে এককথায় আত্মহত্যা বলে ।

কিছু মানুষ নেশার মত । কিছু সম্পর্ক অভ্যাসের মত । এদের কখনো ছাড়া যায় না, ছাড়তে গেলে ভীষণ কষ্ট হয় । কেননা ভালোবাসার চেয়ে বড় কোন অসুখ এই পৃথিবীতে নেই।

আহমেদ মুসা

অপেক্ষা

-জানো সাহেব বাবু, হাজার বর্গফুটের এই কংক্রিটের সাদা দেয়াল ঘেরা আমার ঘর;
ঘরের এক কোণে ঐ চার ফুটের থাই কাচের জানলা
দিয়ে প্রতিরাতে আমি যখন দূরের নীল আকাশ দেখি;
নিজেকে বড্ড একলা একা লাগে জানো।
সারা আকাশ জুড়ে থাকা নীলিমা যেন তোমাকে ভেবে
আমার এই একাকিত্বকে আরও বাড়িয়ে তোলে।
কোন একসময় বলেছিলে, নীল রং ছিল তোমার প্রিয়;
অথচ তুমিসব সময় কালো নিয়ে মেতে থাকতে।
তাইতো আজো প্রতি রাতে কালো অন্ধকারে বসে আমি নীলিমায় ভাসি,
তোমার তোমার প্রথমা হবো বলে।
আমি নিরু। নিরুপমা বলছি সাহেব বাবু, আমি নিরুপমা।
এভাবে ঠিক যতবার তোমার প্রথমা হতে চেয়েছি,
প্রতিবার তুমি আমাকে ঠেলে দিয়েছো দূরে, আরও দূরে।
থাই কাচের ওপাশে আকাশে শুধু জোছনার বলি-রেখার নয়
নিকশ কালো গাঢ় অন্ধকারেরও নাকি নানা রঙ থাকে সাহেব বাবু! তুমি
দেবে বলেছিলে;

অন্ধকারের পর অন্ধকারে মিলেমিশে হারিয়ে যায় একেকটা রঙ,
শেষ পর্যন্ত তুমি আর হাতড়ে দেখো নি আমাকে।
জানো? ইদানিং হঠাৎ হঠাৎই গাঢ় ধূসর ঝাপসা হয়ে আসে
আমার চোখে, তোমার নীল আকাশ সাদা থাই কাচের ওপাশে।
অদূরে কোথাও ঝিঁঝিঁ পোকার ডাকে চমকে উঠি,
এই বুঝি মাঝরাতে রিংটোন বাজিয়ে ডেকে যাবে আমাকে,
নিরু শুনছো?
"আর কত রাত জেগে নীল আকাশ দেখে চোখের নিচে কালো দাগ ফেলবে?
তার চেয়ে বরং সকালে উঠে কাজল নিও, এখন শুয়ে পাড়ো।"
চাতকের মতো চেয়ে থেকেছি সাহেববাবু, অথচ তুমি একটিবারও ফিরে ডাকোনি।
আমি তোমার কাছে ফেরার অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে
জানলার রেলিং ধরেই ঘুমিয়ে পড়েছি।
সকাল হবার সাথে সাথেই ভিন্ন পুরুষের কামার্ত লোভাতুর
দৃষ্টিসূর্যের তাপের মতোই তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হয়েছে আমাকে ঘিরে।
সেখান তুমি রাস্তার ধারে নিদ্রিত নারীর দলকে একদিন পুরুষ হবার ভয় দেখিয়েও,
আমাকে একবারও ফেরাতে আসো নি সাহেব বাবু।
অথচ তুমি সব জানতে- সব! আমি নিরু।
নিরুপমা বলছি সাহেব বাবু।
আজো আমি নীল রং দেখি, কালো অন্ধকার দেখি,
নীল আকাশ দেখি,
নীল আকাশ সাদা থাই কাচে গাঢ়-ধূসর ঝাপসা হতে দেখি,
চমকে উঠে মাঝরাতে রিংটোনের অপেক্ষায় থাকি;
অপেক্ষা করতে করতে তোমার নিরুপমা ক্লান্ত সাহেব বাবু।
তবুও অপেক্ষা করি, তুমি আসবে।
তুমি আসবে নীলিমায় ভাসবে, ভালবাসবে।
হঠাৎই পিঠে হাত রেখে বলবে,
'আর কত শূন্য আকাশ দেখবে নিরু, এবার থেকে আমাকে দেখো।'

শুভ্রজিৎ বড়ুয়া
গর্ভধারকের সন্তান

সুপ্রিয় পাঠশিল্পী, এ হৃদয় নিংড়ে বেরিয়ে আসা শব্দসমষ্টিকে
আপনারা ভুল করেও কবিতা ভাববেন না।
করোটির ভেতরে হাঁসফাঁস করতে থাকা শব্দগুলোকে হাতের প্রবল ভালোবাসায়
প্রসব করেছি নির্মমতর স্বস্তির প্রলোভনে; তাই এটি কবিতা নয়, আমার সন্তান।
পৃথিবীর ইতিহাসে একমাত্র আমিই গর্ভধারক পিতা
যে পৃথিবীর বুকে উপহার দিলাম সৌন্দর্যের প্রতিনিধিত্ব করার মতো সন্তান;
যাকে তার মা অদ্যবধি সন্তান হিসেবে গ্রহণ করে নি,
এমনকি স্বীকৃতিও দেয় নি।
তার মায়ের সাথে আমার সূক্ষাতি-সূক্ষ অনুভূতির সঙ্গমে, আনন্দ-বেদনার সম্মিলনে
শরীর ও মনের একাত্মকরণে এই সন্তান এসেছিলো আমার করোটি-গর্ভে।
গর্ভভেদী এ সন্তানকে আমি রসহীন, প্রেমহীন ছলনার
পৃথিবীতে এনেছি অবিকল তার মায়ের মতো করে।
তার মা ও আমার দূরত্বের ব্যবধান কয়েক লক্ষ আলোকবর্ষের;
তবু আমার স্মৃতির পাতায় ঘুণ ধরতে দেই নি,

চোখের পাতায় দুঃস্বপ্ন আসতে দেই নি,
তার মসৃণ অবয়ব এঁকে রেখেছি মমির মতো করে।
তার মা একদিন খেয়ালের ভুলে,
হেয়ালি ছলে আমার কাছে এসেছিলো, ভালোবেসেছিলো
লজ্জাভরা কণ্ঠে চেয়েছিলো- সঙ্গম।
আমিও পরম মমতায় তাকে জড়িয়ে ধরলাম,
সারা গায়ে এঁকে দিলাম চুমো,
দাঁতের দাগ কেটে দিলাম তার স্তনে, জঙ্ঘায়
যোনি ভেদ করে আমার শিশ্ন গ্রহণ করে কিছু ডিম্বাণু।
এসবে আপনারা অভ্যস্থ নন বলেই
বুঝতে ব্যর্থ হচ্ছেন এই সঙ্গমের অবৈজ্ঞনিক চিত্রপট।
নিষিদ্ধ প্রণয় অপ্রকাশ্য বলেই আপনাদের কাছে
ভালোবাসা মানে সঙ্গমের প্রস্তুতি, মূল্যবোধহীন দুঃব্যবহার
হাজার অযুহাতে গড়া একটি বিচ্ছেদেরে পূর্ব-অধ্যায়।
আপনারা এতো মিথ্যুক কেন!
শরীর ও মনকে আলাদা ব্যারাকে রাখার মিথ্যে
কিভাবে বলেন এতো সহজে!
আমি জানি, এর উত্তর নেই;
কেননা আপনারা কবি নন।
নাগারিক যাপনে আপনারা প্রত্যেকে
একেকজন নগরের রোবট।
সূর্যের কৃত্রিম আগুন ধার নেয়া চুরুটে টান দিতেই ভুলে যান-
গতরাতের সঙ্গম-স্মৃতি।

মোবারক খান হৃদয়

দুঃসময়ের বারান্দায় শ্রী'দি

শ্রী'দি কে শেষবার দেখেছিলাম রায়পাড়া স্টেশনে।
সেই মায়াবী হাসি মুখে ঝুলিয়ে বলেছিলো- ভালো থাকিস সুবল!
বিপরীতে বলার মত কিছু ছিলনা আমার।
আমার মৌনতায় নিদারুণ আঘাত দিয়ে হুইসেল ছাড়ে ট্রেন।
শ্রী'দির কাছে আমার ভালো থাকা, শ্রী'দি চলে যাচ্ছে!
আমি কাকে বলবো 'ভালো নেই'?
রাতঘুমের পাটফর্ম ছেড়ে সময়ের আনুপাতিক দূরত্বে বিলীন হয়ে যায় শ্রী'দি।
সেদিনের পর শ্রী'দি কে আর দেখিনি কোন ঘুমে।
স্বপ্নের মত নিদারুণ শূন্যতা নিয়ে শ্রী'দির বাড়ি জেগে থাকে দিনরাত।
শ্রাবণী'দি কে আমি শ্রী'দি বলে ডাকতাম।
আমার বয়সী অন্য ছেলেদের জন্যে শ্রী'দি ছিল নিতান্তই যৌনতার অবাধ মূর্তি।
আমি ভাবতে পারতাম না।
আমার খুব বিচ্ছিরি লাগতো শুনে।
আমি দৌড়ে পালাতাম শ্রী'দির কাছে।
শ্রী'দি আমাকে গল্প শোনাতো।
চৌদ্দ বছর বয়েসী আমার গল্পের প্রতি টান ছিল না।
অকারণ মনযোগী শ্রোতা বনে থাকতাম পুরো গল্প জুড়ে।
শ্রী'দির গল্পে থাকতো রূপকথা।
আমি রূপকথা পছন্দ করতাম না।
শ্রী'দিকে পছন্দ করতাম।
শ্রী'দি অরুণ'দার কথা জিজ্ঞেস করতো নানা বাহানায়।
আমি মনে মনে হাসতাম।
শ্রী'দি অরুণ দাকে পছন্দ করতো।
আমি শ্রীদিকে।
শ্রী'দি জানতো না অতি সাধারণ শ্রী'দির জন্যে অরুণ'দা না।
আমি মিথ্যে বলতাম শ্রী'দিকে।
বলতাম, অরুণ দা তোমার কথা জানতে চেয়েছে শ্রী'দি।
বলতাম, অরুণ দা তোমাকে চিঠি দিবে বলেছে।
শ্রী'দির মুখ লজ্জায় লাল হতো।
চিঠি পড়তে না জানা শ্রী'দি বানোয়াট দুঃখ পেতো।
শ্রী'দির দুঃখ, আমার চোখে হাহাকার।

নবারুণ কাকা ছাড়া শ্রী'দির কেউ ছিলোনা।
শ্রী'দির মাতাল বাবা।
নবারুণ কাকাকে কেউ পছন্দ করতো না।
রাত দুপুরে পড়ে থাকতো মাতাল হয়ে।
শ্রী'দি টেনে নিয়ে ঘরে তুলতো তার বাবাকে।
সেবার মদের পয়সার জন্যে নবারুন কাকা চুরি করলো আমাদের ঘরে।
বাবা আর জ্যাঠামশাই শাস্তির দোহাইয়ে মানুষ জড়ো করে বেঁধে পেটালো নবারুন কাকাকে।
তাচ্ছিল্যের ভয়ঙ্কর দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে ছিল সবাই।
শ্রী'দির চোখের জলের বদলে মৌন চিৎকার ছাড়া কিছুই করার ছিলনা আমার।
আমার শ্রী'দির চিৎকারগুলো গিলে নিচ্ছিলো বাতাস।
নবারুন কাকা মরে গেলো তৃতীয়দিন।
শ্রী'দির উঠানে আর কেউ ছিলনা তারপর।
আমি সন্ধ্যা হলেই শ্রী'দির উঠানে গিয়ে দাঁড়াতাম।
আধমরা তুলসী গাছের বোবাকান্না আর সেলাইমেশিনের খটখট আওয়াজ কানে নিয়ে ঘরে ফিরতাম প্রতিদিন।
শ্রী'দির হাসি দেখিনি অনেককাল।
শ্রী'দিকে অনেককিছু বলার ছিল আমার।
অরুণ'দা র কথা বানিয়ে বানিয়ে শ্রী'দির উঠানে ঘুরতাম আমি।
লোকেরা নবারুণ কাকার জমি গিলে নেয় যেভাবে রাত গিলে নেয় আলো।
শ্রী'দি না খেয়ে ঘুমানোর দিনগুলিতে অরুণ'দার ঘরে ঢাকঢোল বাজে বিয়ের।
শ্রী'দি নিথর চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে।
আমি শ্রী'দির চোখের দিকে তাকাতে পারিনা।
একসন্ধ্যায় রায়পাড়ার মেজো ঠাকুর শ্রী'দির ঘরে ঢুকে।
সেলাইমেশিনের খটখট আওয়াজ নিভে আসে।
তুলসীগাছের বোবাকান্না শুনি আমি।
পরদিন সকালে কী অবলীলায় শ্রী'দি ঝুলে যায় দড়িতে।
আমার জাগতিক আকুতি মিথ্যে করে দিয়ে শ্রী'দি দড়িতে ঝুলে!
আমি ভাবতে পারিনা।
আমার খুব বিচ্ছিরি লাগে দেখে।
আমার চিৎকার আসে।
আমি দৌড়ে পালাই।
শ্রী'দিকে অনেক কিছু বলার ছিল আমার।
শ্রী'দি শুনলো না।

অক্ষর অনীক

অতঃপর নিশাগম

তোমাকে খুঁজতে গিয়েছি সুস্থ মস্তিস্ক নিয়ে
দরোজার কপাটে কড়া নেড়েছি স্তব্ধ অন্ধকারে,
বিশ্বাস হাতে এসেছি আমি, দাঁড়িয়েছি কৃষ্ণপক্ষে
স্বেচ্ছায় হাতে কড়া পড়েছি দ্যাখো-
ফুলেছে রক্তাক্ত শিরা।
তোমার দু'চোখের অন্ধকারে ভ্রুমধ্য স্থলে দেখা
লাল টিপ।
কেউ এঁকেছে গহীন রাতে সূর্যের সামঞ্জস্যতার তালে,
তোমার মেয়েলি কণ্ঠে হারিয়ে যাওয়া শীতল বাতাসে
প্রেমের সঙ্গিত।
বাতাসের সাথে মিশে থাকা আফিমের গন্ধ
ক্ষুধার্ত নষ্টবীজ।
সমুদ্র থেকে এক আঁচলা জল এনে দিয়েছি
তোমার পায়ে,
তুমি প্রশান্ত রক্তাক্ত নষ্টনীড়ে, আমি খুঁজে পাইনি
তোমার শেষ চিহ্নমাত্র।
তুমি হারিয়েছো পৃথিবীর কোলাহলে
ঘুমিয়েছো রোমশ ঘাসের বিছানায়,
তুমুল তুফান ঝড়ে থুবড়ে পরা কিছু
চিৎকার ধ্বনি !
আজো বাতাসের সাথে কানে আসা ;
"তোমাদের শেষ হলে,
আমার দেহটা সাদা কাপড়ে মুড়িয়ে দিও-
আমার সন্তানরা দেখলে বড় কষ্ট পাবে।"
এই বলে চোখ বুজেছিল যে নারী (তুমি) -
সে আমার মা।

বোরহানউদ্দীন

ভাতের বদলে কবিতা খাই

ক্ষুধার্ত পেটে বিছানায় এপাশ ওপাশ গড়াগড়ি করতে করতেই টের পাই; তীব্র দাবদাহে পেটের ভেতর হেটে চলছে একটা তপ্ত দুপুর।ক্ষুধাতুর শীৎকারে আমার শরীর হোতে বেড়িয়ে পড়ছি আমি। অতৃপ্তির সঙ্গমে রূঢ় বাস্তব হাত টেনে খুলে নিচ্ছে শরীর হোতে চামড়া। ক্রমশ কি অদ্ভুতভাবেই ভূলে যাচ্ছি; প্রেয়সীর শরীর, মাঙশাসী প্রেম। বিছানা হোতে নিচে পড়ে যায় কবিতার বই। আমি ঘুমিয়ে পড়ছি এবঙ
পুনরায় জেগে উঠছি, এপাশ ওপাশ গড়াগড়ি করছি, বিড়বিড় শব্দে চাপা স্বরে বলে উঠছি;
-প্রচণ্ড খিদা লাগছে গো মা...
ঘরে খাওনের মতন কিছু আছে কি?
একটু পরেই মা- আমার সামনে এনে দেয়;
কড়াইয়ে ছটফট করতে থাকা- কই'য়ের তেলে কই ভাঁজা; এক বাটী দেশী কই'য়ের কড়কড়া কবিতা।

অ্যালেন সাইফুল

কাতরতা

সিগারেটে আগুন না ধরিয়ে টানার উপকারিতা নিয়ে প্রবন্ধ লেখা যায়
রেটিং পয়েন্ট কম বলে প্রকাশকরা যেহেতু ছাপে না
নামকরা প্রাবন্ধিকদের কেউ লেখে না।
চোখ থেকে সকাল সরিয়ে দুপুর এনে দেয় দেয়াল ঘড়ি
গ্রাম্য নববধূ হালিমা খাতুন চুলোর ভেতর ঠেলে দেন এক জোড়া শুকনা কাঠ
দাউদাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে
টাকি মাছের শরীরে অদৃশ্য হয়ে যায় মসলার ঘ্রাণ।
হাতের সিগারেট কানে গুঁজে দেই কাঠমিস্ত্রীর পেন্সিলের মতোন
আগুন ধরালেই শেষ।
হালিমা খাতুন টাকি মাছ খান না
স্বামীর তৃপ্তির ঢেকুরের পর দুপুরের খাবারে তার পেটে থাকে কেবল ধবধবে সাদা ভাত
যেহেতু হালিমা খাতুনদের শেখানো হয় স্বামী সেবা শ্রেষ্ঠ ধর্ম
যেহেতু শেখানো হয় মুখ বুঝে সব মেনে নেবার কৌশল
হালিমা খাতুনের জন্য বেশ দুঃখ হয়–
এমন কথা অবশ্য লিখতেও ভয়
লিখলেই একদল বলে ওঠে ;
পরস্ত্রীকাতর
আরেক দল বলে ওঠে ;
পরশ্রীকাতর–
দুপুর বেলা নিজের পেটে ভাত নেই বলে
হালিমা খাতুনের পেটের ধবধবে সাদা ভাত দেখে শালা দুঃখ করছে।

ইবনে শামস
কবিতা এবং শরীরবিজ্ঞান

পৃথিবী এক পোয়াতি নারী যেন-
রানের সন্ধিস্থল থেকে উদিতেছে আদিত্য। আলোর বলয়ে নাঁচিতেছে
স্তনের মতোন পাহাড়। বিরহের শিষ বাজাইতেছে সমুদ্র। নদী -পৃথিবীর
শিরা- জুড়ে শান্তির বয়ান।
গ্রীবাতে এসে ডুবে যাইতেছে সূর্য। রাত হলেই বুঝি বাড়ে জন্মদানের
বেদনা। ওভাবেই ডুকরাচ্ছে রাত;
যেভাবে চিৎকারে চিৎকারে জানাইতেছে সন্ড়ানের জীবন মায়ের আত্মা।
অন্ধকার ছড়ায়ে রেখেছো পিঠ ও বুকে সমানভাবে- চুলের এতো
বিস্তারে অন্ধ হয়ে গেছে আলো।
চাঁদ ডুবে যাইতেছে নাভীমূলে। এক বিয়ত দূরে জেগে আছে পর্বতের রাগ ও অভিম-
ান। অভিধান হয়ে শুয়ে আছে লোম - ঘাস।
পৃথিবীর জ্ঞানময় প্রকৃতিতে - তোমার চোখের মতো - ঝুলে আছে প্রেমিকের
হৃৎপিন্ড।
আতাফলের ঘ্রাণ পাওয়ার মতোই দৌড়াইতেছে হাওয়া।
মানুষের আয়ুর মতো ফুরিয়ে যাইতেছে পৃথিবীর জীবন।

সুমিত রনি
অট্টহাসি

সমতলীয় চাষাবাদের এক প্রাচীন যোনি
নিক্সন টিউব আর নিয়ন গ্যাসের সামঞ্জস্যতা;
অন্ধকার সভ্যতার জন্ম দেয় এক নগরবিলাসী প্রেমিকা।
খুলে দেখা প্রাচীর যেন এক প্রস্ড়র যুগের নিদর্শন জানান দেয়'
চর্মচক্ষুর অনুধাবনের আগ্রহে খসে পড়া কয়েকফোঁটা জীবনরস।
তার ভেতর কি রয়?
রহস্যবৃত্ত নাকি উন্নত চৌচির যার দুই ভাগে বিভক্ত এক আইল ধরে হেঁটে চলা
দুরন্ড় যুবকের বসন্ড়কালীন লাল কৃষ্ণচূড়া জানান দেয় আমায় মুক্ত কর লালিত
পাপবোধ থেকে।
নিম্ন কেশর নিয়ে খেলা করে গুটিকয়েক শুয়োপোকা;
প্রেমিকার পাদদেশে নেমে আসা ঢালে নাগরিক চাষাবাদে অনুমতি নেয়া হয়নি
ঈশ্বরকালীন সভ্যতার।
শুক্রানু ডিম্বানুর প্রথম নিষেকে গোলাপ পাঁপড়িসহ
রক্তাক্ত হয়ে বলেছিল কুমারীত্ব উৎসর্গিত হল তোমাতে এবার সূর্যোদয় এনে দাও!
আমি তখন ভোরের জানালায় পরপর তেইশটি সূর্যোদয় ডেকে এনেছিলাম।
অতঃপর সবগুলো জোৎস্না অন্ড়র্বাসে লুকিয়ে বলত আমি পাক্ষিক।
অশীলতার অভিযোগ;
তাই কবিতা আর মধ্যাঙ্গুলি একে একে বয়ে বেড়ায় পাপবোধ।

রাইসুল নয়ন
রাষ্ট্র নাকি রাণী

বুদ্ধিনাশী বোধ এতো ক্ষীপ্রতায় রোধ করেছে চোখ,
সংসদ ভবনটাকে কিন্ডারগার্টেন মনে হয়,
বাচ্চাদের ভুলে মাতৃকা কাফনে হারিয়ে ফেরে।
অসুখের অসুখে নোনাজলে সাধ ভাসে, এখন আর কথা বলা যায়না!
বুকের একদিকে ধর্মান্ধের অস্ত্র, অন্যদিকে সুবিধাবাদীদের লাঞ্ছনা।
জিহ্বাও এখন রাজনৈতিক শকূন, যাচ্ছেতাই শব্দে বাধা।
আওড়াই মুখস্ত কথা, প্রেমিকার বুকের তিল, নাভী মূলের আদ্রতা; প্রশ্ন করা হয়না!
"আপনারা যে দামী গাড়ি-বাড়ি আর-পোলাও-মাংস চোদাচ্ছেন,
এদিকে পুতুলিরা ভাত-কাপড় পায়না" এভাবেই কি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করছেন?
আমি কথা বলতে পারিনা!
কে যেন বুকের পরে চেপে বসে!
প্রিয় বন্ধু, যার সাথে ভাগাভাগি করে মদ কিনি, গাজা টানি,
সেও বলে, "কি, বলছিস কি এসব? মাদারচোদ! সুখে থাকতে ভালাগেনা?
কবিতা চুদিয়ে কি হবে শুনি?
পা'টাও তো ঠিক করে চাটতে জানিস না,
নেই কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা! বাঁচবি কি করে শালা?
এটা পৃথিবী, তোর কবিতার ডায়েরী না।"
আমি তখন ভাবি, রাষ্ট্রকে যারা পোয়াতী করে শূয়োরের জন্ম দেয়,
তাদের কাছে- স্বাধীনতা কনডমের দামে কে বিক্রি করে দিয়েছে? রাষ্ট্র নাকি রাণী?

ফারুকুর রশিদ
কোথায় গড়াবে, শুন্যতা

আমি জানি নিবীর্য কাপুষের দল তোমাকে আমার থেকে ছিনিয়ে
নেয়ার সহজতম পথটি খুঁজে পেয়েছে। ওরা আমাকে তুমিহীন
করার অব্যর্থ উপায় পেয়েছে।

ওরা আমাকে তোমার সারা জীবনের স্মৃতি সমেত কোন এক কালো
রাতে, কালো কাপড়ে আমার সেই চোখ; যা তুমি

বারে বারে ছুঁয়ে দেখেছ,

সেই চোখে কালো কাপড় বেধে দাঁড় করাবে কোনো এক নির্জন ধানক্ষেতে। তারপর
নিয়ম মেনে নিয়ম শেখাবে। আমি শুধু তোমাকে, তোমাকেই, শুধু তোমাকেই আর
একটি বার দেখতে চাইব প্রিয়তমা! কিন্তু আমি জানি ওরা তা দেবে না। এই নিরেট
কংক্রিটের দেয়াল, সফেদ ফেনা, গাংচিল আর
নিকষ কালো পানিকে স্বাক্ষী রেখে আমি তোমাকে হারাব প্রিয়তমা! শেষের সেই সময়
তোমাকে হারানোর কষ্ট আরো তীব্র হয়ে উঠলেও আমি শান্তিতে মরতে পারব, কারণ
আমি আর জানব না

আমার আর কোন কোন সাথী

খুব ভোর বেলায় স্বজনহীন, প্রিয়তমহীন হয়ে তোমাদের এই সাধের পৃথিবী থেকে
চলে গেল! শেয়াল শকুনেরা মাংস খুবলে নেয়ার সময় ভাবে না এখানে কার পেলব
হাতের স্পর্শ ছিল! শত শত পঁচে যাওয়া দলিত মাংস কঙ্কাল শরীরে উঠে আসবে,
বেজন্মা জারজ সময় স্বাক্ষ্য দেবে না, তবুও তারা উঠে আসবে। প্রেয়সীর ভেজা ঠোঁট,
মরাল গ্রীবা, উন্নত নাকের ভাঁজে জমে থাকা ক্লেদ বিন্দু, গহিনে জড়িয়ে থাকা অবুঝ
প্রেমের স্পর্শে তারা উঠে আসবে।
কেননা তারা জানে নাজিমের সময়ে এক বছরের শোকের আয়ু
এখন বড় জোর দুদিন!

সাম্য রাইয়ান
মৃত্যুপূর্ব গান

অনন্ত ঘুমের ভেতরে আমি ঢুকে গেলাম, অসামান্য প্রেমের চোরাস্রোতে; বিলুপ্ত জীবাশ্মের বুকের উপরে বসে, ধূসর অন্ধকারে দেখা হলো তোমার সাথে। বলি, কেমন আলোর ধারা তুমি, ছায়া মাড়িয়ে চলে যাও!

– স্পর্শশীল প্রজাপতি জানে না কার চোখে ঘুম।
– হারানো পরীর ডানা খুলে রাখো জয়ন্তিকা।
– গুটিকয় ঢেউ কী প্রকারে ভারি হয়ে আছে জুতার পৃথিবীতে!
– জীর্ণ নীলের ভিতরে প্রলয়, শান্তপাহাড়। কিছুটা অবাক।
– অনির্দিষ্ট জন্মের দিকে কিছু মৃত্যু ছুঁড়ে দিও সত্যিকারের ফুল।
– অবাক বনসাই তোমাকে ধারণ করেছে অধিক আশ্চর্যে।
– তিনটে বাজে মৌ, শীতরাত্রি আজ, হলা হবেনা কোথাও।
– তামাক ফুলের বাগান ছিলো অন্তিম অরণ্যে একা!
– শান্ত একটা কোলাহল ছেয়ে যাচ্ছে বার্ধক্যবিলাসে।
– মুছে যেতে যেতে মৃদু হাসি হয়ে ঝুলে আছো উত্তাল হাওয়াঘর।
– অবাক, অবাক হও; দ্বিধাহীন ঢেলে দিচ্ছি পাতে দূরের বনবিড়াল।
– কমলার জ্যান্ত জোঁক উদ্বেলিত ভালবাসার মতোই মিলিয়ে যাচ্ছে!
– ঈষৎ কাৎ হয়ে থাকা মৌনতা মেলে ধরে দমকলের আলো।
– সামান্য প্রেমের দিকেই ধাবিত পাখিদের সমস্ত গমন।
– তারকার তরঙ্গরাশি থেকে চাপা আর্তনাদের সাথে কারা ঝরে পড়ে!
– মাঝে মাঝে এক-দুইটা মধ্যরাত দেয়ালে গেঁথে রাখি।
– ভাসমান বাঈজীর হৃদয়ে নিস্ফল উদ্বেগ গাঢ় হয়ে আসছে।
– তুমি দ্যাখো নাই ওইখানে, নিরস্ত্র নাভির দিকে বহমান রাতের সংগীত।
– অ্যাশট্রে ভারি হয়ে আছে প্রস্তরিত কূটাভাসে।

আতিক রহমান

শুনলাম, তোমার স্বামী নাকি ডাক্তার?

শুনলাম, তোমার স্বামী নাকি ডাক্তার?
দেহের প্রতিটি শিরা উপশিরা নখদর্পনে!
কিন্তু তোমার বুকের ভিতরে যে-ছোট্ট শিশুর বাস,
তা হয়তো সে আজও খুঁজে পায়নি।
বিছানায় প্রতিদিন দেহের প্রতিটি অংশ খুবলে খাবার পরও,
তোমার ঠোঁটের উপর দুটি তিল নিয়ে মাথা ঘামায়নি!
তোমার নজরুল প্রিয়,
আমার ছিলো রবীন্দ্রনাথ!
তর্ক করতাম প্রায়শ দুজন।
কাদম্বরী শ্রেষ্ঠ নাকি নার্গিস?
এ্যানা স্কট নাকি প্রমীলা দেবী!
কে ভালোবেসেছিলো কবিদের?
তর্কের ডালপালা মেলতে মেলতে
আকাশে গিয়ে ঠেকলেই,
সহসা কেঁদে দিতে!
আমার বহুদিন লেগেছে বুঝতে-
এসব ছিলো অভিনয় তর্ক জয়ের!
আমিও সুবোধ বালকের মতো; তোমাকে জিতিয়ে দিতাম প্রতিবার!
আচ্ছা তোমার স্বামী কি- নজরুল বা রবীন্দ্রনাথ নিয়ে আমাদের মত তর্কে লিপ্ত হয়?

নাকি বাঙ্গালীর ভুড়ি মোটা স্বামীগুলির মত দেহ ভোগ করেই ডেকে নিয়ে আসে কুম্ভকর্ণকে?
প্রায়শ বলতে তোমাকে নিয়ে কবিতা লিখার জন্য।
শুধু তোমাকে নিয়ে!
প্রীতিলতা আর নির্মল সেনের মত ভালোবাসার কবিতা,
তাদের ঠোঁটে রাখা ঠোঁট; শ্লোগান কিংবা বিপ্লবের কবিতা।
তাদের ভালোবাসা আর আত্মত্যাগের কথা বলে কেঁদে দিতে প্রায়।
ফটিকের মত ভালোবাসার কাঙ্গাল হয়ে আমারও যে মৃত্যু হবে;
তা হয়তো তুমি জানতে!
তাই অবচেতন মনে আমাকে তাই ডাকতে।
এক অমাবস্যায় তুমি আমাকে প্রথম বলেছিলে-
অতীত বারবার নাকি ঘুরে আসে।
প্রীতিলতা-নির্মল সেনরা এক হয় না কোন কালে,
শুধু তাদের নাম বদলায়, আর বদলায় শরীর!

হিমেল হাসান বৈরাগী
খুঁজতে গিয়ে

তোমাকে খুঁজতে গিয়ে ঢেউ শুদ্ধ তুলে এনেছি কয়েকটা সমুদ্র, মাটি খুঁড়ে ফের মাটিচাপা দিয়েছি সমগ্র পৃথিবীকে। তুমি কে? আকাশের থেকেও বিস্তৃত কেউ? দীগন্তের অধিক দীর্ঘ বুঝি তোমার ডানা?
তোমার ঠিকানা খুঁজতে খুঁজতে,
দৈর্ঘ্যের চেয়ে প্রস্থে বড় মাথামুণ্ডুহীন হা করা জটিল এক থৈ থৈ শূন্যতার ভেতর ঢুকে পড়েছি আচমকা। বোবান্ধ ঝিঝি'র ন্যায় একা একা ক্ষত থেকে আলো ঢেলে দিয়েছি যতই, গহীন বালুচরে জলের অভাবে ছায়াহীন বৃক্ষের মতো কুঁজো হয়ে গেছে অপেক্ষার দিনগুলি
তোমাকে নয়, তোমার উপেক্ষা পেয়ে...
গর্ভ থেকে পালিয়ে গেছে অঙ্কুরিত বীজ, মেঘেদের মেয়ে।
চিঠিতে লিখেছে সে-
"এবার কুয়াশার ফলন ভালো হলেও
পাতার সতেজতা ঝরে যাবে,
ফুল তার সৌরভ হারাবে,
সত্য সে পাখি আর উড়বে না আকাশে।"
তোমাকে না পেয়ে আজ...
এই শীতে
আমিও নিজের কবর নিজে খুঁড়েছি, সাবধানে কফিনে পেরেক ঠোকার পর নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করেছি স্নান। বন্ধুত্ব, দুরত্ব, ঘৃণা, অপমান ইত্যাদি যার যা কিছু পাওনা ছিলো বুঝিয়ে দিয়েছি।
মৃত্যুর সমস্ত আয়োজন যখন চূড়ান্ত; ঠিক তখনই ধাঁরালো চাকু, চাবুক ও

আগুনের ছদ্মবেশে অপরিচিত কতগুলো মন খারাপ চারপাশ থেকে ঘিরে ধরেছে।
এমন স্বেচ্ছামৃত্যুর মুহূর্তে কেই বা চায় আগুনে পুড়তে? অপঘাতে মরবো না বলে
আত্মরক্ষার জন্য তড়িঘড়ি করে মদ ঢাললাম গ্লাসে, গোগ্রাসে পান করলাম, হেঁড়ে
গলায় গান ধরলাম, পঁচিশ টা সিগেরেট টানলাম গুনে গুনে।
অত:পর তুমি বিষয়ক সব বিষাদক্রিয়া ধুয়ো ও ধূলোর মতো উড়ে গেলো শূন্যে
মহাশূন্যে
তোমাকে নয়,
তোমার উপেক্ষা পেয়ে আমার হৃদয়
আজ অনেকটাই ভুলে গেছে তোমার,
তোমাকেই মনে আছে শুধু।
এখন আমি এতই হারামি যে,
চাইলেই ভুলে যেতে পারি চোখের পলকে
তোমাকে, তোমার প্রতিশ্রুতি, তোমার ডাক নাম।
তোমাকে না পেয়ে আজ একা একা নিজেকে মাতালাম
একা একা একা একা একা একা নিজেকে বাঁচালাম।

শুভনীল

জুনমাসের ডায়েরী

আপনাকে থামতেই হবে। উচ্চতায় পৌঁছে গেলে নিচে পড়ে যাবার ভয়। গভীরে চলে গেলে ধ্বসে যাবার ভয়।আকস্মিক উড়ালে উড়ে গেলে ডানাভাঙার ভয়, সাঁতারে ভেসে গেলে ডুবে যাবার ভয়। আর এমন অসংখ্য ভয় নিয়েই আপনাকে থামতে হবে। এর মানে এই নয় যে থেমে যেতেই পৃথিবীতে এসেছেন আপনি। তাহলে পৃথিবীতে কেন আসে মানুষ! এ জিজ্ঞাসাও অবান্তর কেননা কেউ তো নিজের ইচ্ছের বশে পৃথিবীতে আসে না। তাহলে ভালোবাসাকে কীভাবে ব্যাখ্যা দেয়া যায়! নদীর সাথে কোনো যোগ আছে কিনা এই নিয়ে অনেক কথা ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে। কিন্তু কী হলো! এই ভাবতে ভাবতে একটা দৃশ্য চোখে ভাসে। দেখি, এক যুবক পৃথিবীকে তার নেশায় মাতাল করে নিঃসঙ্গতায় থেমে আছে। কোনো সুখ এমন দৃশ্যে থাকে না। যেহেতু সবকিছু পেয়ে গেলে সুখ বোধ কোথাও থাকে না, মানুষের। তাহলে কী হলো! তবে কি তাকে মরে যেতে হবে! নাকি ডুবে যেতে হবে! তাহলে তাকে উড়ে যেতে হবে। তাহলে তাকে ধ্বসে যেতে হবে। কিন্তু এত কিছুর পরেও কোথায় যায় মানুষ! মূলত এইসব জিজ্ঞাসা ঘুমের ভাষায় মিশিয়ে মানুষের মৃত্যু হয়।

অনির্বাণ সূর্যকান্ত
জেনারেল সিরিজ থেকে

জেনারেল সাহেব
পুড়িয়ে ফেলুন নগরের সুইসাইড স্কোয়াডে (মা)লাউন এক পাখি।
পুড়িয়ে ফেলুন পাঠক
পুড়িয়ে ফেলুন শুষ্ক রক্তের হিমোগোবিন
পুড়িয়ে ফেলুন রক্ত দিয়ে লেখা বিজিত জাতির কবিতা
পুড়িয়ে ফেলুন সান্ধ্য ট্যাক্সির বিষন্নতা
পোড়াতে পারবেন পরস্ত্রীর স্থায়ীত্ব যে স্নান করে একা? আর ফিরে আসে বুলেটের দূর্ব্যবহারে !
পরস্ত্রীর হৃদয়ে ভয় নেই
পরস্ত্রী সত্যে নেই, মিথ্যাতে নেই,
নিঁচু মাথাতে নেই।
পরস্ত্রী চিনে ফেলে কুকুর যে আরেকটি কুকুরকে চেনে।

তামান্না তুলি
আমি আর ফিরবোনা

তোমার প্রদেশ ফেরত মাতালের মুখে গান ও গানওয়ালা তুমি কি ম্যাজিক জানো ?
কন্টিকারির কাঁটায় কাঁটায় গলিত জোসনার ফুল
তোমার প্রদেশ ঢেকে যায় চম্পা, চামেলীর চাঁদে
মায়ার ওসুখে ভুগে ভুগে ভালোবাসছি খুব
এমন সহজে পোড়ালাম ঠোঁট যেনো কত্ত চেনা
ঐ প্রদেশের কঙ্কালসার বুক!
নিন্দুকে বলে অনিন্দিতার শরীর খারাপ, সুরাচ্ছন্ন মাতালের বুক চিবুতে চিবুতে
মেয়েটা নষ্টা।
অথচ, আমার ছাদ ভেসে যায় দূরতম আহ্বানে
মুখে, বুকে, পাঁজরে আমূল ভাঙ্গন নিয়ে
দূরতম প্রদেশের পূণ্যফুলের প্রত্যাদেশ
ভাসতে ভাসতে ঠাঁই করেছে স্ড়নের চিলেকোঠা।
বুক ঢাকো, মুখ ঢাকো, গানের বাক্সবন্দি ছেঁড়াতার ঢেকে দাও!
ও গানওয়ালা ঝুমঝুমি বাজাতে বাজাতে প্রচ- একটা আত্মঘাত করি?
লেপ্টে থাকি প্রদেশান্তরের ঊরুসন্ধিতে?
স্বপ্নের ভিতর লম্বা টানেল, লাইব্রেরী মাঠ, অফিস ফেরত লিফট, জামা-জুতা
কি ভয়ঙ্কর সম্মোহনে ডুবছি আকণ্ঠ মাতালের টানেলে
এখানে প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত, কঙ্কালসার খোলা বুক!
জিপার খুলেছে চৌকাঠ - আমি আর ফিরবো না।

সোয়েব মাহমুদ
শনিবারটা ভালো লাগেনা আমার

প্রতিটা জীবিত মানুষের ভেতর একটা করে মৃত মানুষ হাটে, অস্থিরতায়।
প্রতিটা পরাজয়ে তুমি শানিত হও, প্রতিটা জয়ে এগিয়ে যাও ধ্বসে।
তুমি সেই আঙুল যা একদিন ঠিক যথেচ্ছাচারে কেউ ঠেকিয়েছিলো তোমার ঠোঁটে।
সে যাকগে মলয়, জায়েদ... একদিন ধ্রুব আবার ঘরে ফিরবে কবিতার ঘরে,
একদিন ডাক্তার বুঝবে একটা কবিতা লেখার জন্য জন্মের সময়,
তা আলোকিত রেস্তোরাঁর ছাইপাশে নষ্ট হচ্ছে।
হিমেল, আপনার সাথে রাস্তায় চলাচল খুব কম আমার,
হয়ত টুকটাক কথা হয়, দেখা সে আরও কম।
জানেন রুবেল এক ভ্রষ্ট নিরোধ, খেয়ে দিচ্ছে রাস্তায় খেলা ফুটবল অথবা ইথারের কবিতা।
রাইসুল নয়ন আর আরণ্যক টিটো আর মাইকেল রবিন পেছাচ্ছেন কবিতা সে'তো জন্মেই পরাজিত ঈশ্বর এক,
তাকে পরাস্ত করবার, তাকে জাদুঘরে তুলবার কোনও যোগ্যতা
কলেরা হাসপাতালের সাবেক কর্মীর আছে বলে মনে হয়না।
রাশা আর হৃদয়, প্রসেনজিতের মতন অবাক অক্ষরে,
মাঝেমাঝে কেমন যেনো প্রিন্স হারিয়ে হারিয়ে ঘুরতে থাকেন জহিরের মতন
ঘরে ফিরতে চেয়ে হুটহাট পড়ে যান বাজারে।
এলেন আর জামি আশায় রাখে ফুয়াদের মতন নিমগ্ন দুপুরে জান্নাতের পথ ধরে পথিক হবে বলে।
সকাল, একটা সূর্যোদয়ের আশায় আপনারা বারবার মাহফিলে যাচ্ছেন,
হয়ে উঠছেন ইতিহাসের দীর্ঘদেহী নিঃশ্বাস এক।
শহরের কালো রাজপথ রক্তাক্ত সে অনেক আগে থেকেই জানেন।
বৃথামাংস ফেলে যাচ্ছেন কার আশায়?
তুলি আর মৌ জানেন শহরের উঁচু সারি নীচু জিহবা বাধাগ্রস্ত জংঘা।
স্তনমৈথুণ অথবা এংলো ইনকা জাতির জনক হা হা হা
করে হাসতে হাসতে এগুনো স্থুল স্থিরচিত্র যেখানে,

কবিতা ছেড়ে আপনাদের মতনই ইবনে শামস আঁকছেন ছবি।
আর তার পাশেই যেখানে কবিতার অবকাশ নেই
অথচ আতিক আর হৃদয় বসে চা খাচ্ছে, কবিতা ভাবছে, লিখছেনা কিছুই।
ইলতুত মন্ডল, বোরহান প্রেমের কবিতা দ্রোহের কবিতা বলে বলে ভাগাড়ে চলছে ভাগ।
সহমত কবি শুনুন মানুষ কেবলই মানুষ
ভালো মন্দ বিশেষণ নাই বা জুড়লেন হতাশাটুকু ছাড়ুন এবার।
এত এত সব কবি হা হা কা রে,
অথচ আমি হাহাকার লিখতে স্পেস দিয়ে বসি।
আমার কবিতা হয়না বলেই আমি চেয়ে রই,
আমার শব্দ বাক্যগঠন প্রণালীতে ভুল হয় বড়,
আমার ছন্দ মাত্রার জ্ঞান নেই, আমার আলো টানবার যোগ্যতা নেই
মিথ্যে ফেরেশতা মিছিল নেই সাদতের মতন,
আমি প্রিতির মতন বিখাউজ আঙুলে তুলে আনতে পারিনা নখে; আমার নাকের ময়লা।
আমি প্রথমালো কবি নই তাই লেখাগুলো বিক্রি করে ম্যাটসিলস চুষতে চুষতে বলতে পারিনা
- আজ বিক্রি হই, সবাই চিনুক তারপর কবিতা লিখবো।
জানেন আমি একদিন রাত দুইটায় বনী ইসরাইলের সামনে
ডাক দিয়ে ফেলি বিপদজনক মহিলাকে কারওয়ানবাজারে, পরদিন শিরোনাম
রাষ্ট্রীয় স্তনে নিহত কবি!
মিছে প্রতিবাদ প্রতিরোধ প্রতিঘাত কবিতার জলাতঙ্ক!
যাক স্বস্তিতে মজহারের মাজহাব গোষ্ঠী।
স্বস্তিতে বরিশালে একজন মনিরুল মেরাজ যিনি একদিন কবিতা লিখতেন!
কবিতা লিখে টিখে কি আর হবে বলেন, কবিতা কি খাওয়ায় পড়ায়? দেয় নিশ্চিত জীবন?
সেই ভালো আপনারা তাহলে সবাই যার যার মতন চুপ করে থাকুন।।
যেভাবে ৯-৫টা চুপ হয়ে গেছেন রাকিবুল হায়দার,
যেভাবে পাশ কাটিয়ে কবিতা, পত্রিকার নোটিশ লিখছেন মাহতাব তুহীন।
যেভাবে ব্যঙ্গয় নিয়ে খাবি খেতে খেতে সাম্য লিখছেনা,
লিখছেনা হয়ে যাচ্ছে সমালোচক অর্ক।
আর যেভাবে টুইটার টিউশনিতে রোবায়েত, পড়ে আছে উর্ণ ফণা তোলা গিটারের তারে।
যেভাবে অনির্বাণ জানিয়েছে অস্বীকৃতি মিউটেশন মিউট্যান্ট
মিলিশিয়া বাহিনীর তক্তপোষের খরপোষে।

যেভাবেঅস্থিরতায় একজন মাহবুব ময়ুখ রিশাদ লাথি মারতে চেয়েও
শব্দ হবে ভেবে তাকিয়ে থাকে নগর উন্নয়নের চৌধুরী ফাহাদের দিকে।।
যেভাবে জয়ন্ত জিলু বারবার রেডিওলোজীর কঠিন তত্ত্বে খুঁজে ফিরছে মুক্তির সনদ।
রুদ্রনীল উদয়ন আর দেবুদা আছেন বিন্দাস,
কবিতা টবিতা ছোড় দে মেরে ভাই- নকিবও ব্যস্ত মাতবরী চালে।
অনেক হলো এবার এসব থাক- শুনুন একবার
আচ্ছা যদি কোনও দিন বীরশ্রেষ্ঠ মতিউরের কবরের মতন বুদ্ধিজীবী বুদ্ধিবেশ্যারা
হতশ্রী করে কবিতার জমিন - লিখিয়ে নিলো অনুভবের ওড়নায়,
কালপরশু কালপুরুষের অনুবাদে অথবা জামিল সৌরভের কলমে
আসমা অধরার শানিত বাক্যে আমার এপিটাফে-
“ইহা সো রাহা হ্যায় এক গাদ্দার...”

ভাবুন তো......
সে সব কথা থাক রাতে ঘুম ভালো হয়েছে
শাদা শার্ট গুজে দিয়ে প্যান্টের ভেতর আমি সরকারি কর্মচারী,
প্রতিটা নোট থেকে তুলে আনি-
চাহিবা মাত্র ইহার বাহককে দিতে বাধ্য থাকিবে
ব্যাস আর কিছু নয় -
কে লিখলো কবিতা আর কে লিখলোনা রাতভর সেটা নিয়ে আমার যন্ত্রণা কেনো,
ভুলে যান ভুলে যান তারচেয়ে বরং নিরোধ কিনে দিয়ে যান,
নিরোধমুক্ত সঙ্গমে বিশ্বাসী আমি হয়ে গ্যাছি আপনাদের মতন।
ভুলে যান তারচেয়ে বরং
মনে রাখুন, কেবল “কবিতা কিছুই নয় কবিতা এক মিথ্যের ধর্মযাজক”
ব্যাস খেলা শেষ।